সুলতানার স্বপ্ন
SULTANA'S DREAM

বেগম রোকেয়া

ঐতিহ্য

উৎসর্গপত্র

বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনো প্রবেশ করি নাই। কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয় স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন, দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন,– কিন্তু তথাপি ঈশ্বর-প্রসাদে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই এবং ভ্রাতাও কাহারও বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে ইংরাজী পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই। স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি আমার সেই জ্যেষ্ঠ সহোদর–যাহার অসাধারণ কৃপায় আমি এই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমাকে স্বাধীন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছে, তাহারই করকমলে সমর্পিত হইল।

সুলতানার স্বপ্ন

একদা আমার শয়নকক্ষে আরাম কেদারায় বসিয়া ভারতললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম,– আমাদের দ্বারা কি দেশের কোন ভাল কাজ হইতে পারে না?–এই সব ভাবিতেছিলাম। সে সময় মেঘমুক্ত আকাশে শারদীয় পূর্ণিমার শশধর পূর্ণগৌরবে শোভমান ছিল; কোটিক্ষ তারকা শশীকে বেষ্টন করিয়া হীরক-প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। মুক্ত বাতায়ন হইতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানটি স্পষ্টই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এক একবার মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ শেফালিসৌরভ বহিয়া আনিয়া ঘরখানি আমোদিত করিয়া দিতেছিল। দেখিলাম, সুধাকরের পূর্ণ কান্তি, কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, রজতচন্দ্রিকা– ইহারা সকলে মিলিয়া আমার সাধের উদ্যানে এক অনির্বচনীয় স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছ। তদ্দর্শনে আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম,– যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! ঠিক বলিতে পারি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না;– কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম।

সহসা আমার পার্শ্বে একটি ইউরোপীয়া রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কী প্রকারে আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমার পরিচিতা 'ভগিনী সারা' (Sister Sara) বলিয়া বোধ হইল। ভগিনী সারা "সুপ্রভাত" বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন! আমি মনে মনে হাসিলাম,– এমন শুভ্র জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে তিনি বলিলেন, "সুপ্রভাত!" তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কেমন? যাহা হউক, প্রকাশ্যে আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম,–

"আপনি কেমন আছেন?"

"আমি ভাল আছি, ধন্যবাদ,। আপনি একবার আমাদের বাগানে বেড়াইতে আসিবেন কি?"

আমি মুক্তবাতায়ন হইতে আবার পূর্ণিমা-চন্দ্রের প্রতি চাহিলাম,– ভাবিলাম, এসময় যাইতে আপত্তি কী? চাকরেরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন; এই

অবসরে ভগিনী সারার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করা যাইবে।

দার্জিলিং অবস্থানকালে আমি সর্বদাই ভগিনী সারার সহিত ভ্রমণ করিতাম। কত দিন উদ্ভিদকাননে (বোটানিকাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে লতাপাতা সম্বন্ধে–ফুলের লিঙ্গ নির্ণয় সম্বন্ধে কত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি, সে সব কথা মনে পড়িল। ভগিনী সারা সম্ভবতঃ আমাকে তদ্রূপ কোন উদ্যানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন; আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত বাহির হইলাম।

ভ্রমণকালে দেখি কি–এ তো সে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী নহে!– এ যে দিব্য প্রভাত! নগরের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রাজপথে লোকে লোকারণ্য! কী বিপদ! আমি দিনের বেলায় এভাবে পথে বেড়াইতেছি! ইহা ভাবিয়া লজ্জায় জড়সড় হইলাম–যদিও পথে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই।

পথিকা স্ত্রীলোকেরা আমার দিকে চাহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। আমি তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম, যে তাহাদের উপহাসের লক্ষ্য বেচারী আমিই। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,–

"উহারা কী বলিতেছে?"

উত্তর পাইলাম,– "উহারা বলে, যে আপনি অনেকটা পুরুষ ভাবাপন্ন।"

"পুরুষভাবাপন্ন। ইহার মানে কী?"

"ইহার অর্থ এই, যে আপনাকে পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়!"

"পুরুষের মত লজ্জানম্র!" এমন ঠাট্টা! এরূপ উপহাস তো কখন শুনি নাই! ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গিনী সে দার্জিলিংবাসিনী ভগিনী সারা নহেন,– ইহাকে আর কখনও দেখি নাই! ওহো! আমি কেমন বোকা– একজন অপরিচিতার সহিত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! কেমন একটু বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত হইল। তাহার হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম কি না, তিনি আমার হস্তকম্পন অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন,–

"আপনার কী হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে!"

এরূপে ধরা পড়ায় আমি লজ্জিত হইলাম। ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; আমরা পর্দানশীন স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।"

"আপনার ভয় নাই– এখানে আপনি কোন পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এ দেশের নাম 'নারীস্থান'* এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।"

ক্রমে নগরের দশ্যাবলী দেখিয়া আমি অন্যমনস্ক হইলাম। বাস্তবিক পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্য অতিশয় রমণীয় ছিল। সুনীল অম্বর দর্শনে মনে হইল যেন ইতিপূর্বে আর কখন এত পরিষ্কার আকাশ দেখি নাই! একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখিয়া ভ্রম হইল, যেন হরিৎ মখ্‌মলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। ভ্রমণ কালে আমার বোধ হইতেছিল, যেন কোমল মসনদের উপর বেড়াইতেছি,– ভূমির দিকে দৃক্‌পাত করিয়া দেখি, পথটি শৈবাল ও বিবিধ পুষ্পে আবৃত! আমি তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, "আহা! কী সুন্দর!"

ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সব পছন্দ করেন কি?" (আমি তাহাকে 'ভগিনী সারা'ই বলিতে থাকিলাম, এবং তিনিও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

"হ্যাঁ এসব দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুমস্তবক পদদলিত করিতে চাই না।"

"সে জন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনার পদস্পর্শে এ ফুলের কোন ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিশেষ এক জাতীয় ফুল, ইহা রাজপথেই রোপণ করা হয়।"

দুইধারে পুষ্পচূড়াধারী পাদপশ্রেণী সহাস্যে শাখা দোলাইয়া দোলাইয়া যেন আমার অভ্যর্থনা করিতেছিল। দূরাগত কেতকী-সৌরভে দিক্ পরিপূরিত ছিল। সে সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য–আমি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলাম, "সমস্ত নগরখানি একটি কুঞ্জ ভবনের মত দেখায়! যেন ইহা প্রকৃতি-রাণীর লীলাকানন! আপনাদের উদ্যানরচনা-নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"

"ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে পারেন!"

"তাহাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য করিতে হয়, তাহারা কেবল উপবনের উন্নতিকল্পে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক মনে করিবেন।"

---

* "পরীস্থান" শব্দের অনুকরণে "নারীস্থান" বলা হইল। ইংরাজীতে "লেডীল্যাণ্ড" বলা গিয়াছে।

"ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কী বলিতে পারেন? জানেন তো অলসেরা অতিশয় বাক্‌পটু হয়!"

আমার বড় আশ্চর্যবোধ হইতেছিল, সে দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? রাজপথে শতাধিক ললনা দেখিলাম, কিন্তু পুরুষ বলিতে একটি বালক পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষে কৌতূহল গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরুষেরা কোথায়?"

উত্তর পাইলাম, "যেখানে তাহাদের থাকা উচিত সেইখানে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।"

ভাবিলাম, তাহাদের "উপযুক্ত স্থান" আবার কোথায়, আকাশে না পাতালে? পুনরায় বলিলাম, "মাফ করিবেন, আপনার কথা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের উপযুক্ত স্থানের অর্থ কী?"

"ওহো! আমার কি ভ্রম!—আপনি আমাদের নিয়ম আচার জ্ঞাত নহেন, একথা আমার মনেই ছিল না। এ দেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।"

"কি! যেমন আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেইরূপ তাহারাও থাকেন না কি?"

"হ্যাঁ, ঠিক তদ্রূপই।"

"বাঃ! কী আশ্চর্য ব্যাপার!" বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিলাম। ভগিনী সারাও হাসিলেন! আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম;— পৃথিবীতে অন্ততঃ এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে! ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল!

তিনি বলিলেন, "ইহা কেমন অন্যায়, যে নিরীহ রমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর পুরুষেরা মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। কী বলেন, সুলতানা, আপনি ইহা অন্যায় মনে করেন না?"

আমি আজন্ম অন্তঃপুরবাসিনী, আমি এ প্রথাকে অন্যায় মনে করিব কিরূপে? প্রকাশ্যে বলিলাম,-"অন্যায় কিসের? রমণী স্বভাবতঃ দুর্বলা, তাহাদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।"

"হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন,— যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে! তা কোন বন্য জন্তু কোন একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও তো সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না। কি বলেন?"

"তাহা ঠিক; হিংস্রজন্তুটা ধরা না পড়া পর্যন্ত গ্রামটি নিরাপদ হইতে পারে না।"

"মনে করুন, কতকগুলি পাগল যদি বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়ে, আর তাহারা অশ্ব, গবাদি–এমনকি ভাল মানুষের প্রতিও নানা প্রকার উপদ্রব উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তবে ভারতবর্ষের লোকে কি করিবে?"

"তবে তাহারা পাগলগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাতুলাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।"

"বেশ! বুদ্ধিমান লোককে বাতুলালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া দেশের সমস্ত পাগলকে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় আপনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন না?"

"অবশ্যই না! শান্তশিষ্ট লোককে বন্দী করিয়া পাগলকে মুক্তি দিবে কে?"

"কিন্তু কার্যতঃ আপনাদের দেশে আমরা ইহাই দেখিতে পাই! পুরুষেরা– যাহারা নানা প্রকার দুষ্টামী করে, বা অন্ততঃ করিতে সক্ষম, তাহারা দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করে, আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে! অশিক্ষিত অমার্জিতরুচি পুরুষেরা বিনা শৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন?"

"জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,– তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়–তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।"

"তাই তো! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়,– 'দোষ কার, বন্দী হয় কে!' কিন্তু বলি, আপনারা ওসব নিগড় পরেন কেন?"

"না পরিয়া করি কি? 'জোর যার মুলুক তার'; যাহার বল বেশি, সেই স্বামিত্ব করিবে– ইহা অনিবার্য।"

"কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্তব্যের ক্রটি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের

কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত– আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।”

“শুনুন ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারের সমুদয় কার্য করি, তবে পুরুষেরা কী করিবে?”

৩তাহারা কিছুই করিবে না,– তাহারা কোন ভালো কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখুন।”

“কিন্তু ক্ষমতাশালী নরবরদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী করা কি সম্ভব, না সহজ ব্যাপার? আর তাহা যদিই সাধিত হয়, তবে দেশের যাবতীয় কার্য-যথা রাজকার্য, বাণিজ্য ইত্যাদি– সকল কাজই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে!”

এবার ভগিনী সারা কিছু উত্তর দিলেন না; সম্ভবতঃ আমার ন্যায় অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবলার সহিত তর্ক করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন!

ক্রমে আমরা ভগিনী সারার গৃহতোরণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বাড়ীখানি একটি বৃহৎ হৃদয়াকৃতি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ ভাবটি কি চমৎকার!–ধরিত্রী জননীর হৃদয়ে মানবের বাসভবন! বাড়ী বলিতে, একটি টিনের বাঙ্গালা মাত্র, কিন্তু সৌন্দর্যে ও নৈপুণ্যে ইহার নিকট আমাদের দেশের বড় বড় রাজপ্রাসাদ পরাজিত! সাজ সজ্জা কেমন নয়নাভিরাম ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে– তাহা কেবল দেখিবার জিনিষ!

আমরা উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। তিনি সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন; একটি খঞ্চিপোষে রেশমের কাজ করা হইতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও সেলাই জানি কি না। আমি বলিলাম,–

“আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেলাই ব্যতীত অন্য কাজ জানি না।”

“কিন্তু এদেশের অন্তঃপুরবাসীদের হাতে আমরা কারচোবের কাজ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না!” এই বলিয়া তিনি হাসিলেন; “পুরুষদের এতখানি সহিষ্ণুতা কই, যে তাহারা ধৈর্যের সহিত সুঁচে সুতা পরাইবে?”

তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, “তবে কি কারচোবের কাজগুলি সব আপনিই করিয়াছেন?” তাঁহার ঘরে বিবিধ ত্রিপদীর উপর নানা প্রকার সলমা চুমকির কারুকার্যখচিত বস্ত্রাবরণ ছিল।

তিনি বলিলেন, “হাঁ, এ সব আমারই স্বহস্ত প্রস্তুত।”

"আপনি কিরূপে সময় পান? আপনাকে তো আফিসের কাজও করিতে হয়, না? কী বলেন?"

"হাঁ। তা আমি সমস্ত দিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্তব্য শেষ করি।"

"দুই ঘণ্টায়! আপনি একি বলেন?– দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য শেষ হয়! আমাদের দেশে রাজকর্মচারীগণ– যেমন মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।"

"আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্যপ্রণালী দেখিয়াছি। আপনি কি মনে করেন, যে তাঁহারা সাত আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?"

"নিশ্চয়! বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।"

"না প্রিয় সুলতানা! ইহা আপনার ভ্রম! তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন! কেহ আবার আফিসে থাকিয়া ক্রমাগত দুই তিনটি চুরুট ধ্বংস করেন। তাহারা মুখে যত বলেন, কার্যতঃ তত করেন না। রাজপুরুষেরা যদি কিছু করেন তো তাহা এই, যে কেবল তাহাদের নিম্নতম কর্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ! মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন!"

তাই তো! অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না! ভগিনী সারার সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। শুনিলাম, তাহাদের নারীস্থান কখনও মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় না। আর তাহারা আমাদের ন্যায় হুলধর মশার দংশনেও অধীর হন না! বিশেষ একটি কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম,–নারীস্থানে নাকি কাহারও অকালমৃত্যু হয় না। তবে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা হইলে লোকে অপ্রাপ্ত বয়সে মরে, সে স্বতন্ত্র কথা। ভগিনী সারা আবার হিন্দুস্থানের অসংখ্য শিশুর মৃত্যু সংবাদে অবাক হইলেন। তাঁহার মতে যেন এই ঘটনা সর্বাপেক্ষা অসম্ভব! তিনি বলিলেন, যে প্রদীপ সবে মাত্র তৈল সলিতা যোগে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কেন (তৈল বর্তমানে) নির্বাপিত হইবে? যে নব কিশলয় সবে মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে কেন পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে ঝরিবে!

ভারতের প্লেগ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল; তিনি বলিলেন, "প্লেগ টেলেগ কিছুই নহে– কেবল দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া

পড়ে। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশি,– নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশি হয়, এবং প্লেগে দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র রমণী অধিক মারা যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়–মূল কারণ ঐ অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক তো দেখি!”

তাই তো, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিম্বা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন? প্লীহা– স্ফীত উদর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালায় দরিদ্রদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাহাদের রন্ধনশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পর্দা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল! একি রন্ধন-গৃহ, না নন্দনকানন? রন্ধনশালার চতুর্দ্দিকে মনোরম সবজী বাগান এবং নানাপ্রকার তরিতরকারীর লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর ধূম বা ইন্ধনের কোন চিহ্ন নাই,– মেঝেখানি অমল ধবল মর্মর প্রস্তর-নির্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুসজ্জিত! আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,–

“আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও তো অগ্নি জ্বালিবার স্থান দেখিতেছি না?”

তিনি বলিলেন, “সূর্যোত্তাপে রান্না হয়। অতঃপর কী প্রকারে সৌরকর একটা নলের ভিতর দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি তৎক্ষণাৎ এক পাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধন প্রণালী দেখাইলেন।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কী প্রকারে?”

ভগিনী বলিলেন, “কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন আমাদের বর্তমান মহারাণী সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিলেন। তিনি নামতঃ রাণী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রী রাজ্যশাসন করিতেন।

“মহারাণী বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞান চর্চা করিতে ভালবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি বৃথা সময় যাপন করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল, যে তাঁহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হউক।

মহারাণীর খেয়াল,– সে খেয়াল তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইল! অচিরে গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকা স্কুল স্থাপিত হইল। এমনকি পল্লীগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয়-স্রোত প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না– এই আইন হইল। আর এক কথা, এই পরিবর্তনের পূর্বে আমরাও আপনাদের মত কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।"

"এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!" এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

"কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান তো সেই প্রকারই আছে! কতকদিন তাহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি! পরিবর্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।"

"আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং মহারাণী,– আর কি কোন অভাব থাকিতে পারে? অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা-প্রিন্সিপাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করিলেন; এই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থানে করা গেল,– বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল,– এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত করিলেন! বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্বদা ঐ বেলুনের সাহায্যে জল গ্রহণ করিত কি না, তাই আর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডি প্রিন্সিপাল প্রাকৃতিক ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।"

"বটে? তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দ্দম দেখিলাম না!" কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না,–নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব? তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি!–তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোন পুরুষে পরিচয় নাই! সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোন মতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন :–

"দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর-বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল,-- অতিহিংসায়* তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্ধিত হইল। প্রিন্সিপাল মনস্থ করিলেন, যে এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই, যাহাতে কাদম্বিনী-বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়! তাহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন, তদ্দ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে,– তাহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামত যথা তথা বিতরণ করিতে পারেন।"

"যৎকালে এদেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। যখন নরবীরগণ শুনিতে পাইলেন যে জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জলগ্রহণ করিতে এবং সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমনকি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্যপ্রণালীকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের কার্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর! কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কী প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দী করিলেন? কোনরূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন না কি?"

ভগিনী বলিলেন, "না।"

"তাহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও তো সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী হইবে কোন্ পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাই বটে!"

'কে প্রথমে পুরুষ প্রবরদের পরাভূত করিল,– সম্ভবতঃ কতিপয় নারীযোদ্ধা?"

"না, এদেশের পুরুষদল বাহুবলে পরাস্ত হয় নাই।"

"হ্যাঁ,–ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্বল নহে। তবে?"

---

* হিংসা বৃত্তিটা কি বাস্তবিক বড় দোষণীয়? কিন্তু হিংসা না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা হয় কই? এই হিংসাই তো মানবকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে। তবে দেশকাল ভেদে ঈর্ষায় পতন হয়, সত্য। তা যে কোন মনোবৃত্তির মাত্রাধিক্যেই অনিষ্ট হয়; সকল বিষয়েরই সীমা আছে।

"মস্তিষ্ক বলে।"

"তাহাদের মস্তিষ্কও তো রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?– কি বলেন?"

"মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কী? হস্তীর মস্তিষ্কও তো মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারী, তবু তো মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে!"

"ঠিক তো! কিন্তু কী প্রকারে কর্তারা বন্দী হইলেন, এ কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন–আর বিলম্ব সহে না!"

"স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে–অনেক যুক্তি তর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনা চিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক, দশ বৎসর পূর্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপালদ্বয় বাধা দিলেন। তাহারা বলিলেন, যে তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

"ভারী আশ্চর্য!" আমি অতি আনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, "এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া 'স্বপ্ন-কল্পনায়' বিভোর রহিয়াছেন!"

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন,–

"কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়সঙ্গত সুশাসন বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না,– তিনি কেবল স্বামীত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারাণীকে ঐ আসামী ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাণী তো দয়া প্রতিমা জননীর জাতি– সুতরাং তিনি তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাহারা বীরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল–রক্ত গঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লান বদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল।

"কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে কেশরীবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাৎবর্তী হইতে লাগিল, এবং শত্রুগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইল।

"কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর ভদ্র–সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমনকি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্যন্ত সমরশায়ী হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল; অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী হইতে মাত্র ১২/১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত–আর দুই চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিবে।

"এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জনকতক বুদ্ধিমতী মহিলাকে লইয়া সভা আহ্বান করিলেন। এখন কী করা কর্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।

"কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, রীতিমত যুদ্ধ করিতে যাইবেন; অন্য দল বলিলেন যে, ইহা অসম্ভব– কারণ একে তো অবলারা সমরনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারণেও অক্ষমা; তৃতীয় দল বলিলেন, যে যুদ্ধনৈপুণ্য দূরে থাকুক– রমণীর শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান অন্তরায়।

"মহারাণী বলিলেন, 'যদি আপনারা বাহুবলে দেশ রক্ষা করিতে না পারেন, তবে মস্তিষ্ক বলে দেশ রক্ষার চেষ্টা করুন।'

"সকলে নিরুত্তর; সভাস্থল নীরব। মহারাণী মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যদি দেশ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।"

"এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণ নীরবে চিন্তা করতেছিলেন–এখন অতি ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, বিজয় লাভের আশা ভরসা তো নাই,– শত্রু প্রায় গৃহতোরণে। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন–যদি এই